ফ্ল্যাটল্যান্ড: অ্যা রোমান্স অব মেনি ডিমেনশনস

মূল: এডউইন অ্যাবট

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

সূচিপত্র

প্রথম অংশ: এই জগৎ

১. ফ্ল্যাটল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য

২. ফ্ল্যাটল্যান্ডের জলবায়ু ও ঘরবাড়ি

৩. ফ্ল্যাটল্যান্ডের অধিবাসীরা

৪. মহিলারা

৫. আমরা যেভাবে একে অপরকে চিনি

৬. দেখে শনাক্ত করি যেভাবে

৭. অনিয়মিত চিত্রগুলো

৮. আঁকাআঁকির প্রাচীন প্রথা

৯. সার্বজনীন রঙিন ঠোঁট

১০. রংদ্রোহ নির্মূল

১১. আমাদের পুরোহিতরা

১২. আমাদের পুরোহিতদের প্রথা

দ্বিতীয় অংশ: অন্য জগৎ

১৩. আমার লাইনল্যান্ড দর্শন

১৪. আমার ফ্ল্যাটল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার ব্যর্থচেষ্টা

১৫. স্পেসল্যান্ডের আগন্তুক

১৬. আগন্তুক আমাকে স্পেসল্যান্ডের রহস্য বোঝাতে গিয়ে যেভাবে ব্যর্থ হলেন

১৭. গোলক যেভাবে কথা বলে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে খাতা হাতে নিল

১৮. আমি যেভাবে স্পেসল্যান্ডে গিয়েছিলাম ও যা দেখেছিলাম

১৯. গোলক আমাকে স্পেসল্যান্ডের রহস্য দেখানোর পরেও আমার আরও বেশি চাওয়া; আর তার পরিণাম

২০. আমার দর্শনে গোলকের অনুপ্রেরণা

২১. আমি আমার নাতিকে যেভাবে ত্রিমাত্রিক জগতের ধারণা শেখানোর চেষ্টা করেছিলাম আর তার সাফল্যের নমুনা

২২. পরে আমি যেভাবে তিন মাত্রার ধারণা দূর করার চেষ্টা করলাম আর তার ফলাফল

প্রথম অংশ

এই জগৎ

“ধৈর্য্য ধরুন, কারণ জগৎটা বড় ও প্রশস্ত”

প্রথম অংশ

এই জগৎ

* **১. ফ্ল্যাটল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য**

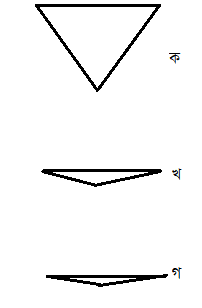
আমাদের জগৎকে আমি ফ্ল্যাটল্যান্ড বলি। আসলে আমরা নিজেরা একে এই নামে ডাকি না। এর বৈশিষ্ট্য আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যেই নামটা দিলাম। আমার সুখী পাঠকরা তো স্বাচ্ছন্দ্যে স্পেসল্যান্ডে বাস করছেন।

বড় এক খণ্ড কাগজ কল্পনা করুন। তাতে আছে রেখা, ত্রিভুজ, বর্গ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ ও অন্যান্য চিত্র। এগুলো এক জায়গায় স্থির থাকার বদলে পৃষ্ঠের উপরে বা মধ্যে মুক্তভাবে চলাচলা করছে। তবে তারা পৃষ্ঠ থেকে উপরে বা নিচে যেতে পারে না। অনেকটা ছায়ার মতো। পার্থক্য শুধু চিত্রগুলো শক্ত। আর আছে উজ্জ্বল বাহু। তবে ছায়ার সাথে তুলনা করলে আমার দেশ ও দেশের বাসিন্দাদের সম্পর্কে মোটামুটি নিখুঁত একটি ধারণা পাবেন আপনি। কয়েক বছর আগে হলে অবশ্য আমি বলতাম “আমাদের মহাবিশ্ব”। তবে এখন আমার চোখ আরও উচ্চ জিনিস দেখেছে।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনারা নিরেট বলতে যা বোঝেন তেমন কোনো কিছু এমন একটা দেশে থাকা সম্ভব নয়। একটু আগে বলেছি আমাদের দেশে ত্রিভুজ, বর্গ ও অন্যান্য কীভাবে চলে। আমার বিশ্বাস আপনারা ধরে নিচ্ছেন আমরা দেখে অন্তত এই চিত্রগুলোকে চিনতে পারি। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে উল্টো। আমরা চিত্রগুলোকে এভাবে দেখি না। অন্তত আলাদা করে চেনার মতো করে তো নয়ই। আমরা সরল রেখা ছাড়াই কিছু দেখি না। বা দেখতে পারি না। একটু পরেই সেটা আমি বুঝিয়ে বলব।

আপনাদের স্পেসের একটি টেবিলে একটি মুদ্রা রাখুন। উপর থেকে এর দিকে তাকান। একে বৃত্তের মতো লাগবে। এবার টেবিলের এক প্রান্তে আসুন। চোখ নিচের দিকে নামাতে থাকুন (এর ফলে আপনি অনেকটা ফ্ল্যাটল্যান্ডের বাসিন্দাদের মতো করে দেখতে পারবেন)। দেখবেন, মুদ্রাটিকে ডিম্বাকৃতির মনে হবে। এবার চোখকে একেবারে টেবিলের পৃষ্ঠ বরাবর আনুন (এবার আপনি সত্যিই ফ্ল্যাটল্যান্ডের বাসিন্দার মতো হয়ে গেলেন)। এবার মুদ্রাটা আর ডিম্বাকৃতিও থাকল না। আপনার চোখে সেটি হয়ে যাবে সরল রেখা।

ত্রিভুজ, বর্গ বা অন্য কোনো চিত্রের ক্ষেত্রেও ঘটবে একই ঘটনা। টেবিলের কিনারে গিয়ে এর দিকে চোখ রাখলে এটি আসলে কিসের চিত্র সে তথ্য হারিয়ে যায়। চিত্রটি রেখার রূপ ধারণ করে। একটি সমবাহু ত্রিভুজের কথা ধরুন। আমাদের সমাজে সে একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। টেবিলের উপর থেকে চোখ রাখলে ব্যবসায়ীকে কেমন দেখা যাবে তা ১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ২ ও ৩ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে টেবিলের পৃষ্ঠের প্রায় বরাবর অবস্থান থেকে দেখলে তাকে যেমন দেখাবে। আর ঠিক পৃষ্ঠের বরাবর অবস্থানে চোখ রাখলে (যেমনটা আমরা ফ্ল্যাটল্যান্ডের লোকেরা দেখি) আপনি একটি সরলরেখা দেখবেন শুধু।

স্পেসল্যান্ডে গিয়ে শুনেছিলাম, আপনাদের নাবিকরাও সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় দিগন্তে দূরের দ্বীপ বা উপকূলকে একইভাবে দেখে। দূরের স্থলভূমিতে হয়ত উপসাগর, অন্তরীপ বা বিভিন্ন সংখ্যক ও বিভিন্ন আকারের বস্তু থাকতে পারে। কিন্তু দূর থেকে এগুলো দেখা যায় না (যদি না তোমাদের সূর্য সেগুলোকে আলোকিত করে আলো ও ছায়াকে আলাদা করে ফুটিয়ে তোলে)। না হলে কিন্তু সেগুলোকে পানির ওপর একটি অবিভক্ত রেখা হিসেবে দেখা যাবে।

আমাদের ফ্ল্যাটল্যান্ডে ত্রিভুজ অন্য কোনো পরিচিত লোক কাছে আসতে থাকলে আমরাও শুধু রেখাই দেখি। আমাদের এখানে সূর্য নেই। ছায়া তৈরি করার মতো অন্য কোনো আলোও নেই। ফলে আপনারা স্পেসল্যান্ডে দেখার ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা পান তার কিছুই আমরা পাই না। আমাদের বন্ধুরা কাছে আসতে থাকলে আমরা দেখি তার রেখাটা বড় হচ্ছে। সে বিদায় নিলে রেখাটা ছোট হয়ে যায়। কিন্তু ঐ রেখাই শুধু। সে হোক ত্রিভুজ, বর্গ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ কিংবা বৃত্ত। সবাই-ই রেখা।

হয়ত জানতে চাইবেন, এত অসুবিধার মাঝে আমরা তাহলে আমাদের বন্ধুদের আলাদা করে কী করে চিনি। তবে আমাদের বাসিন্দাদের সম্পর্কে আরও বললে তবেই কেবল সহজাত এই প্রশ্নের জবাব সঠিক ও সহজ করে বোঝা যাবে। সে বিষয়টা আপাতত থাক। তার চে বরং আমাদের দেশের জলবায়ু ও ঘরবাড়ি সম্পর্কে একটু কথা বলি।

* **২. ফ্ল্যাটল্যান্ডের জলবায়ু ও ঘরবাড়ি**

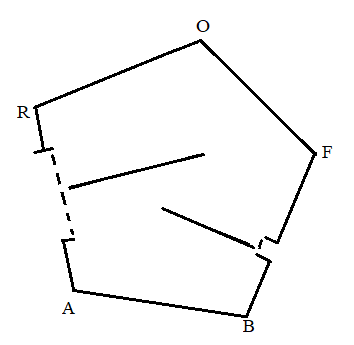
তোমাদের মতোই আমাদের কম্পাসেও চারটি দিক আছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। আমাদের সূর্য বা অন্য কোনো আসমানী বস্তু নেই বলে স্বাভাবিক উপায়ে উত্তর দিক বের করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের নিজস্ব একটি কৌশল আছে। আমাদের প্রকৃতির একটি সূত্র অনুসারে দক্ষিণ দিকে একটি নির্দিষ্ট আকর্ষণ কাজ করে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আকর্ষণটা খুব মৃদু। এ কারণে স্বাস্থ্যবান একজন মহিলাও অনায়াসেই উত্তর দিকে অর্ধ-কিলোমিটার চলাচল করতে পারে। তবুও দক্ষিণ দিকের ঐ মৃদু আকর্ষণটুকুই আমাদের দেশের বেশিরভাগ জায়গায় দিক নির্ণয়ের জন্যে যথেষ্ট কার্যকর।

এছাড়াও বৃষ্টিপাত সবসময় হয় উত্তর দিক থেকে (নির্দিষ্ট বিরতিতে)। এতেও দিক জানা যায়। আর শহরাঞ্চলের বাড়িঘর দেখেও বোঝা যায়। বাড়ির পাশ্ব-দেয়ালগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। যাতে বাড়ির ছাদ উত্তর দিক থেকে আসা বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা দিতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বাড়িঘর নেই। তবে গাছের কাণ্ড দেখে দিক আঁচ করা যায়। সবমিলিয়ে দিক জানা যতটা কষ্টকর মনে হয় ততটা নয়।

আগেই বলেছি, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দক্ষিণে আকর্ষণ খুব হালকা। এ ওঞ্চলের বাড়িঘরশূন্য ও গাছহীন জনমানবহীন এলাকায় অনেকসময় আমি পথ হারিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় আটকে ছিলাম। বৃষ্টি আসলেই তবে পথ চলা শুরু করতে পেরেছি।

দক্ষিণ দিকের আকর্ষণ দুর্বল, বৃদ্ধ ও বিশেষ করে নাজুক দেহের মহিলাদের ওপর বিশাল বপুর পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে কাজ করে। এ কারণে রাস্তায় কোনো ভদ্রমহিলার সাথে দেখা হলে তাকে উত্তর দিক ছেড়ে দেওয়া আমাদের এখানে ভদ্র আচরণ হিসেবে বিবেচিত। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সেটা করা মোটেও সহজ নয়। বিশেষ করে নিজের শরীর বড় হলে বা এমন অঞ্চলে থাকলে যেখানে উত্তর-দক্ষিণ বোঝা কঠিন।

আমাদের বাড়িতে জানালা থাকে না। কারণ বাইরে ও ঘরের ভেতরে আলো সমান। দিনে বা রাতেও সমান। সব সময়ে ও সব স্থানেও আলো একই রকম। তবে আলোর উৎস কী তা আমাদের জানা নেই। পুরনো দিনের পণ্ডিত ব্যক্তিতের কাছে এটা ছিল এক মজার প্রশ্ন। অনেক গবেষণাও করেছেন তারা এ নিয়ে। আলোর উৎসের সন্ধান করা হয়েছে বারংবার। উৎস সন্ধানীদের স্থান হয়েছে পাগলা গারদে। সে অনুসন্ধানের অন্য কোনো ফলাফল আসেনি কখনও।

এরপরেও যারা তেমন চেষ্টা করেছে তাদের উপর অধিক করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। পরে কিছুদিন আগে সংসদ আইন করে এমন গবেষণা নিষিদ্ধ করেছে। আফসোস! আমার দেশ ফ্ল্যাটল্যান্ডে আমিই সে রহস্যের জবাব সবচেয়ে ভাল করে জানি। কিন্তু আমার জ্ঞান আমার দেশের আর কাউকেই বোঝাতে পারি না। আমাকে এমনভাবে উপহাস করা হয় যেন আমি দেশের পাগলদের মধ্যে সেরা। অথচ স্পেস সম্পর্কে সত্যটা একমাত্র আমিই জানি। জানি কীভাবে ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে আলো আসছে আমাদের জগতে। থাক, সেসব দুঃখের কথা না বলে প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

সবচেয়ে প্রচলিত ঘরগুলোতে পাঁচটি বাহু আছে। মানে এগুলো পঞ্চভুজাকার। যেমনটা চিত্রে দেখা যাচ্ছে। RO এবং OF হচ্ছে উত্তরের দুই বাহু। এটাই ঘরটির ছাদ। সাধারণত এতে কোনো দরজা থাকে না। পূর্ব পাশে মহিলাদের জন্যে একটি ছোট দরজা আছে। পশ্চিমের বড় দরজাটা পুরুষদের জন্যে। দক্ষিণের মেঝেতেও সাধারণত দরজা থাকে না।

বর্গাকার বা ত্রিভুজাকার ঘর বানানোর নিয়ম নেই। কারণও আছে এর। বর্গের (তার চেয়ে সমবাহু ত্রিভুজের) কোণ পঞ্চভুজের কোণের চেয়ে অনেক বেশি চোখা। আবার জড় বস্তুর (যেমন ঘর) রেখা পুরুষ ও মহিলার রেখার চেয়ে চিকন। সে কারণে বর্গাকার বা ত্রিভুজাকার ঘরের সাথে অসতর্ক বা উদাসীন কেউ হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে যেতে পারে। ফলে আমাদের পঞ্জিকার একাদশ শতক থেকেই ত্রিভুজাকার ঘর বানানো আইন করে সার্বজনীনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম হলো দূর্গ, অস্ত্রাগার, ব্যারাক ও অন্যান্য রাস্ট্রীয় ভবনগুলো। সাধারণ মানুষরা তো আর সহসা সেখানে যাতায়াত করে না।

ঐ সময়টিতেও বর্গাকার ঘর বানানোর অনুমতি ছিল সব জায়গায়। কিন্তু প্রায় তিন শ বছর পরে আইন করা হলো, যেসব শহরে জনসংখ্যা ১০ হাজারের ওপরে, জননিরাপত্তার খাতিরে সেখানে ঘরের সর্বনিম্ন কোণ হবে পঞ্চভুজের কোণের সমান। মানুষও এখন অনেক সচেতন। ফলে আইনকেও মানুষ সমর্থন দিচ্ছে। এখন গ্রামেও পঞ্চভুজ ঘরই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে থাকা কোনো কৃষি অঞ্চলেই কেবল বর্গাকার ঘর খুঁজে হয়ত পাওয়া যাবে।

* **৩. ফ্ল্যাটল্যান্ডের বাসিন্দা**

ফ্ল্যাটল্যান্ডের পূর্ণবয়স্ক মানুষের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা হবে তোমাদের হিসেবে প্রায় ১১ ইঞ্চি। সর্বোচ্চ ১২ ইঞ্চি ধরতে পারো।

আমাদের নারীরা হলো সরলরেখা।

সৈনিক ও সর্বনিম্ব শ্রেণির শ্রমিকরা হলো ত্রিভুজ, যার দুইটা বাহু সমান ও অপর বাহু অসমান। সমান বাহুগুলো এগারো ইঞ্চি লম্বা। ভূমি বা অপর বাহু এত ছোট (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক ইঞ্চির অর্ধেকের বেশি নয়) যে বাকি দুই বাহু মিলে শীর্ষে খুব তীক্ষ্ণ ও শক্ত কোণ তৈরি করে। আবার এরা খুব বেশি অসম্মানিত লোক হলে ভূমির দৈর্ঘ্য এত ছোট হয় (এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগের বেশি নয়) যে তাদেরকে সরলরেখা বা মহিলাদের থেকে আলাদা করে চেনাই দায় হয়ে ওঠে। শীর্ষটা এতই তীক্ষ্ণ হয়। তোমাদের মতোই আমরাও এ ত্রিভুজগুলো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলি। পরেও এ নামেই এদেরকে ডাকব আমি।

আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমবাহু ত্রিভুজ। মানে ত্রিভুজের সব বাহু সমান।

আমাদের পেশাদার মানুষ ও ভদ্রলোকরা বর্গ (আমি যে শ্রেণিতে আছি) ও পঞ্চভুজ।

এর ওপরে আছে কুলীন সম্প্রদায়। এদের মধ্যে আবার নানান ভাগ আছে। শুরু ছয় বাহুর ষড়ভুজ দিয়ে। এরপর থেকে বাহুর সংখ্যা বাড়তেই থাকে, যে পর্যন্ত না তারা অনেক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের খেতাব পায়। শেষ পর্যন্ত বাহুর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেলে এবং বাহুগুলোকে আলাদা করে প্রায় চেনাই না গেলে বহুভুজকে আর বৃত্ত থেকে আলাদা করে শনাক্ত করা যায় না। এসব মানুষকে তখন বৃত্তাকার বা পুরোহিত শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এটাই সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণি।

আমাদের প্রকৃতির নিয়ম হলো শিশুপুত্রের বাহুর সংখ্যা তারা বাবার চেয়ে একটি বেশি হবে। ফলে আভিজাত্য ও উন্নতিতে প্রতিটি প্রজন্মের অবস্থান আগের চেয়ে উঁচুতে ওঠে। অতএব, বর্গের পুত্র হবে পঞ্চভুজ। পঞ্চভুজের পুত্র ষড়ভুজ। এভাবেই চলতে থাকে।

তবে ব্যতিক্রমও আছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে নিয়মটা সবসময় কাজ করে না। আবার সৈনিক ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তো আরও কম কাজ করে। এরা যেন মানুষ নামটার যোগ্য নয়। কারণ তাদের সবগুলো বাহু সমান নয়। এ কারণে প্রাকৃতিক নিয়ম তাদের জন্যে অকেজো। সে কারণে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ছেলে বাবার মতোই থাকে। তবে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজেরও সব আশা শেষ হয়ে যায়নি। তার সন্তানরা অসম্মানের জায়গা থেকে বেরিয়েও আসতে পারে। দীর্ঘ সময়ের সামরিক সফলতা, কঠোর পরিশ্রম বা দক্ষতার ফসল হিসেবে দেখা যায়, শ্রমিক ও সৈনিকদেরও তৃতীয় বাহু বা ভূমি কিঞ্চিত লম্বা হয়। অপর দুই বাহু হয় খানিকটা ছোট। এদের ছেলেমেয়েদের সাথে আরও উন্নত শ্রেণির বিয়ে হলে (যার আয়োজন করে পুরোহিতরা) সন্তানদের আরও বেশি সমবাহু ত্রিভুজের মতো হয়ে ওঠে।

সমদ্বিবাহু শিশুর সংখ্যা অনেক। সে তুলনায় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ থেকে প্রত্যয়নযোগ্য ও প্রকৃত সমবাহু ত্রিভুজ পাওয়া যায় নগণ্যসংখ্যক।[[1]](#footnote-1)১ এমন শিশুর জন্মের জন্যে অনেক অনেক শর্ত পূরণ হতে হয়। সযত্নে বিয়ের আয়োজন করতে হয়। অবিরত ও দীর্ঘ সময় ধরে বাবাদেরকে প্রদর্শন করতে হয় মিতব্যয়িতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। বহু প্রজন্ম ধরে ধৈর্য্য নিয়মতান্ত্রিকতা ও ক্রমাগত বুদ্ধির বিকাশ করে যেতে হয়।

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ থেকে সমবাহু শিশুর জন্ম দারুণ এক আনন্দের ব্যাপার। জন্মের পর স্যানিটারি ও সোশ্যাল বোর্ড নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে। এরপরেই শিশু সমাবাহু হিসেবে সনদপত্র পায়। আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সমবাহুর শ্রেণির অংশ করে নেওয়া হয়। এবার তাকে তার গর্বিত কিন্তু দুঃখ ভারাক্রান্ত পরিবার থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। সে হয়ে যায় সন্তানহীন কোনো এক সমবাহু পরিবারের সদস্য। শপথ করানো হয়, সে আর কখনও আগের বাড়িতে যাবে না। আগের সম্পর্কের কথা মুখে আনবে না। হয়ত নতুন সৃষ্ট দেহটি অবচেতনভাবেই নিজের পরিবারকে নকল করে গিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

এই দাসশ্রেণি থেকে সমবাহুর জন্মকে পরিবারও ভাল চোখে দেখে। কারণ এতে করে তাদের একঘেয়ে ও ঘৃণ্য জীবনে আলো ও আশার উন্মেষ ঘটেছে। এই জন্মকে অভিজাত সমাজও স্বাগত জানায়। কারণ এই কালেভদ্রে ঘটা এই জন্মগুলোই নিমশ্রেণির মানুষের বিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখে। আর জন্মের ফলে তো অভিজাত শ্রেণির সুবিধায় কোনো কমতি হয় না।

সূক্ষ্মকোণীদের সবার মধ্যেই আশা ও উচ্চাকাঙ্খার অভাব থাকলে তো তারা হয়ত একসময় বিদ্রোহী কোনো নেতা পেয়ে যাবে। সংখ্যা ও শক্তিতে বেশি হয়ে গেলে তারা বৃত্তের প্রজ্ঞাও প্রতিহত করে সফল বিদ্রোহ করে ফেলতে পারে। সেটা ঠেকানোর জন্যেই প্রকৃতির একটি কৌশলী আইন আছে। শ্রমিকগোষ্ঠীর বুদ্ধি, জ্ঞান ও অন্যান্য গুণ যে হারে বাড়বে সে হারেই তাদের সূক্ষ্মকোণ (যার কারণে তাদের আকৃতি ভয়ঙ্কর) বড় হবে। ক্রমেই তাদের বাহুগুলো সমবাহুর ত্রিভুজের অক্ষতিকর কোণের মতো হবে। এমনিতে শক্তিশালী সৈনিক গোষ্ঠীর বুদ্ধি মহিলাদের প্রায় সমান। যখনই তাদের মানসিক দক্ষতা তাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রকে সুবিধা আদায় করার অবস্থায় নিয়ে যায়, তখন কমে যায় তাদের সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্রের শক্তি।

ভারসাম্য রক্ষার কত দারুণ কৌশল! আমি তো বলব, ফ্ল্যাটল্যান্ডের প্রদেশসমূহের অভিজাত সংবিধানে প্রাকৃতিক যোগ্যতার কত নিখুঁত প্রমাণ! প্রাকৃতিক আইনটিকে জায়গামতো কাজে লাগিয়ে বহুভূজ ও বৃত্তরা প্রায় সবসময় বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই নির্মূল করে ফেলে। ব্যবহার করে মানবমনের অদম্য ও অপরিসীম আশাকে। আইন ও শৃঙ্খলাকে সহায়তা করে শিল্পকৌশলও। প্রয়োজন পড়লে রাষ্ট্রীর ডাক্তাররা বুদ্ধিমান বিদ্রোহীদের বাহুকে কৃত্রিমভাবে বড় বা ছোট করে সব বাহুগুলোকে সমান (সুষম) করে দিতে পারেন। এরপর তাদেরকে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির অংশ করে নেওয়া হয়। আরও কম মেধাবী অনেকেই বাকি থাকে। তারাও অভিজাত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাদের স্থান হয় সরকারী হাসপাতালে। যেখানে তাদেরকে আজীবন সম্মানজনকভাবে আটক রাখা হয়। বোকা ও বেয়াড়া ও অপর্যাপ্ত সুষম বাহুর লোকদের দুই একজনকে শেষ করে দেওয়া হয়।

এভাবে বেচারা সমদ্বিবাহুদের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। তারা হয়ে পড়ে নেতাশূন্য। কোনো নতুন নেতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে প্রধান বৃত্ত তার জন্যে ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়। এভাবে বিদ্রোহের পক্ষে আর কেউই অবশিষ্ট থাকে না। অনেক সময় আবার বৃত্ত মহল কৌশলে তাদের মধ্যে হিংসা ও সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারা জড়িয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে। একের কোণের আঘাতে অন্যজন ধ্বংস হয়। আমাদের ইতিহাসে অন্তত এক শ বিশটি বিদ্রোহের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়াও ছোটখাট উত্তেজনার ঘটনা আছে দুশো পঁয়ত্রিশটি। এগুলোর সবই এভাবে শেষ হয়েছে।

* **৩. ফ্ল্যাটল্যান্ডের মহিলারা**

আমাদের সুতীক্ষ্ণ ত্রিভুজাকার সৈনিকরা ভয়ঙ্কর হয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, মহিলারা আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। একজন সৈনিক কীলক হলে একজন মহিলা তো সুঁইয়ের মতো। দুই প্রান্তে অন্তত বিন্দু ছাড়া কিছুই নেই। তার ওপর তারা সহজেই যখন ইচ্ছা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। অতএব, ফ্ল্যাটল্যান্ডের মহিলাদের সাথে ঝামেলা বাঁধানো কোনোভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তবে আমার কিছু তরুণ পাঠক হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে ফ্ল্যাটল্যান্ডের মহিলারা নিজেদেরকে কীভাবে দৃশ্যমান করে তোলে? আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তবে অল্প কথায় সহজেই ব্যাপারটা বোঝানো যাবে।

টেবিলে একটি সুঁই রাখুন। টেবিলের পিঠ বরাবর চোখ রেখে পাশ থেকে এর দিকে তাকালে সুঁইয়ের পুরো দৈর্ঘ্য দেখা যাবে। কিন্তু সুঁইয়ের প্রান্তীয় দিক থেকে দেখলে একটি বিন্দু দেখা যাবে শুধু। বাস্তবে যা অদৃশ্য। আমাদের মহিলারাও এমনই। তার বাহু আমাদের দিকে থাকলে তাকে আমরা সরলরেখা হিসেবে দেখি। চোখ ও মুখ অঙ্গ দুটি আমাদের এখানেই একই রকম। এখন, চোখ বা মুখের দিকে তাকালে কিন্তু শুধু উজ্জ্বল একটি বিন্দু দেখা যায়। আবার পেছনের অংশের দিকে তাকালে কিছুটা অনুজ্জ্বল বিন্দু চোখে পড়ে। এ অংশের উজ্জ্বলতা জড় বস্তুর মতো মৃদু। তার পেছনের প্রান্ত অনেকটা অদৃশ্য টুপির কাজ করে।

মহিলাদের মাধ্যমে আমরা কী পরিমাণ ক্ষতির মুখে পড়তে পারি তা এখন নিশ্চয়ই স্পেসল্যান্ডের কারোই বুঝতে বাকি নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি ত্রিভুজও ভয়ঙ্কর। একজন শ্রমিকের সাথে লাগতে গেলেও জখমের আশঙ্কা আছে। কোনো সামরিক অফিসারের সাথে সংঘর্ষ হলেও আছে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ভয়। ব্যক্তিগত একজন সৈনিকের ত্রিভুজের শীর্ষের স্পর্শেই মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত আছে। তাহলে একজন মহিলার সাথে ধাক্কা লাগলে কী হতে পারে? তাৎক্ষণিক ও সম্পূর্ণ ধ্বংস। আবার মহিলাদের দেখাও যায় না বা গেলেও শুধু মৃদু আলো হিসেবে দেখা যায়, তখন সবচেয়ে সতর্ক পথচারীর জন্যেও ধাক্কা এড়ানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

এই ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্যে ফ্ল্যাটল্যান্ডের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আইন করা হয়েছে। দক্ষিণের কম শীতের অঞ্চলে মহাকর্ষ শক্তিশালী। এখানে মানুষের হঠাৎ ও অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা বেশি ঘটতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে মহিলা বিষয়ক নিয়মকানুন বেশি কঠোর। তবে নিচের সারসংক্ষেপ থেকে আইনের একটি সাধারণ অবস্থা বোঝা যাবে:

১. প্রত্যেক বাড়ির পূর্ব পাশে শুধু মহিলাদের জন্যে একটি প্রবেশপথ থাকবে। সব মহিলা এই দরজা দিয়ে যথাযথ ও সম্মানজনক পদ্ধতিতে[[2]](#footnote-2) প্রবেশ করবে। তারা পুরুষদের জন্যে নির্ধারিত পশ্চিম দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।

২. কোনো মহিলা জনসমাগমস্থলে যেতে হলে অবিরাম শব্দ করতে হবে। অন্যথায় মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

৩. যদি কোনো মহিলা দীর্ঘস্থায়ী সর্দির সাথে তীব্র কাশি বা এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হয় যে তাকে অনিচ্ছাকৃতভাবে নড়াচড়া করতে হয়, তবে তাকে বেশি দেরি না করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এ রোগের সনদ প্রদান করবে সেন্ট ভিটাস ডান্স।

কোনো কোনো রাজ্যে বাড়তি একটি আইন বানানো হয়েছে। মহিলাদেরকে জনসমাগমস্থলে হাঁটলে বা দাঁড়ালে তাদের দেহের পেছনটা অবিরাম ডানে-বাঁয়ে নাড়াতে হবে। যাতে তাদের পেছনে যারা আছে তারা যেন তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলেও এখানেও শাস্তি মৃত্যদণ্ড। কোনো কোনো রাজ্যে আবার আইন হলো মহিলারা ভ্রমণের সময় সাথে ছেলে, চাকর বা স্বামীকে রাখবে। কোনো কোনো রাজ্যে আইন হলো মহিলারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান না থাকলে ঘরের ভেতরেই থাকবে। কিন্তু সবচেয়ে জ্ঞানী বৃত্ত বুঝতে পেরেছে, এত নিয়ম বানানো মহিলাদের ছোট করার নামান্তর। উপরন্ত এসব নিয়মের কারণে ঘরবাড়িতে খুনের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে নিয়মের মাধ্যমে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে।

মহিলাদেরকে বাড়িতে আবদ্ধ করলে বা ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করলে তাদেরভ মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বামী বা সন্তানদের ওপর। কম শীতের অঞ্চলে অনেক সময় দেখা গেছে, মহিলাদের এক বা দুই ঘণ্টার অভিযানে পুরো গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে গেছে। এ কারণে যেসব অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা ভালো সেখানে উপরের তিনটি আইনই যথেষ্ট। আমাদের নারী নীতির এটাই একটি আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

আর যাই হোক, আমাদের নিরাপত্তার প্রধান উৎস নারীরাই। সংসদ নয়। পিছনমুখী গতির মাধ্যমে তারা কাউকে তাৎক্ষণীকভাবে মেরে ফেলতে পারে সত্য। তবে তাদের শরীরের চোখা অংশ অন্য কারও দেহে ঢুকে গেলে সাথে সাথে বের না করে নিলে তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

ফ্যাশনও আমাদের পক্ষে কাজ করে। আমি বলেছি, কিছু কিছু কম উন্নত অঞ্চলে মহিলাদেরকে জনসমাগমস্থলে দাঁড়াতে হলে তাদের দেহের পেছনটা অবিরাম ডানে-বাঁয়ে নাড়াতে হবে। যতটা মনে পড়ে, সুশাসিত রাজ্যগুলোতে এই কাজটি সব শ্রেণির মহিলারা স্বাভাবিকভাবেই করে থাকেন। যে করাই লাগবে তার জন্যে আইন বানানো অবমাননাকর মনে হয়। সম্মানিত মহিলারা সহজাতভাবেই এটা করেন। বৃত্তাকার শ্রেণির পুরুষদের স্ত্রীরা ছন্দে ছন্দে তরঙ্গাকারে তাদের পেছনটা খুব সুন্দর করে দোলাতে পারে। সাধারণ সমবাহুর স্ত্রীরা শুধু পেন্ডুলাম বা সরল দোলকের মতো একঘেয়ে এপাশ-ওপাশ করতে পারে। সেজন্যে এরা বৃত্তের স্ত্রীদের হিংসা করে। অনুকরণের চেষ্টাও করে। আবার সমবাহুর স্ত্রীকে আবার হিংসা ও নকল করে উচ্চাকাঙ্খী বিষমবাহুর স্ত্রী। এদের পিছনমুখী গতির প্রয়োজনই এখনও দেখা দেয়নি। অতএব, উল্লেখযোগ্য সব পরিবারেই পেছনগতি সবসময় ছিল। এসব পরিবারের স্বামী ও সন্তানরা অদৃশ্য আক্রমণ থেকে নিরাপদ।

আমাদের মহিলাদের মধ্যে কোনো মমতা নেই মনে করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। তবে সমস্যা হলো ভঙ্গুর লিঙ্গের এই মানুষদের তাৎক্ষণিক আবেগের কাছে আর সব কিছুই হার মানে। এটা আসলে তাদের হতভাগ্য শারীরিক কাঠামোরই ফল। কোণ না থাকার জন্যে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। কারণ তাদের আবেগ সবার চেয়ে কম। এমনকি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের চেয়েও কম। তাদের কোনো কার্যকর মস্তিষ্ক নেই। ফলে তাদের নেই কোনো চিন্তা, বিচার-বিবেচনা বা ভবিষ্যৎচিন্তা। স্মৃতিশক্তিও খুবই সামান্য। ফলে রেগে গেলেও তাদের কোনো দাবির কথা মনে থাকে না। কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য তারা চিনতে পারে না। আমি একটা ঘটনা জানি যেখানে একজন মহিলা তার পুরো পরিবারকে শেষ করে দিয়ে আধঘণ্টা পরেই রাগ পড়ার পর জিজ্ঞেস করেছে, তার স্বামী ও সন্তানদের কী হয়েছে।

অবশ্য একজন মহিলা সহজে ঘুরতে পারলে কখনও রেগে যায় না। তারা তাদের বাসায় থাকলে আপনি যা ইচ্ছা বলতে বা করতে পারেন। বাসার মধ্যে তারা ঘুরতে পারে না। ফলে তাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়।

1. ১ “প্রত্যয়নপত্র কেন প্রয়োজন?” স্পেসল্যান্ডের সমালোচক হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারেন। একটি বর্গশিশুর জন্মই কি তার বাবার সমবাহু ত্রিভুজ হওয়ার প্রাকৃতিক সনদ নয়? উত্তর হলো, কোনো স্তরের মহিলাই সনদহীন কোনো ত্রিভুজকে বিয়ে করবে না। অনেক সময় কিছুটা বিষমবাহু ত্রিভুজ থেকেও বর্গশিশুর জন্ম হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রথম প্রজন্মের বিষমতা তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে দৃশ্যমান হয়। এরা বর্গ থেকে পঞ্চভুজ হতে ব্যর্থ হয়। অথবা আবার ত্রিভুজ হয়ে যায়। [↑](#footnote-ref-1)
2. তোমাদের স্পেসল্যান্ডে গিয়ে দেখেছি, তোমাদের কিছু কিছু পুরোহিতদের বাসায়ও গ্রামের মানুষ, কৃষক ও বোর্ড স্কুলের শিক্ষকদের জন্যে আলাদা আলাদা দরজা আছে, যাতে তারা ‘যথাযথ ও সম্মানজনক পদ্ধতিতে প্রবেশ’ করতে পারে। [↑](#footnote-ref-2)